বেগম খালেদা জিয়া এখন কোন্ পথে যাবেন?

কালের আয়নায়

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

শেষ পর্যন্ত বিএনপির সুমতি ফিরেছে এবং নানা টালবাহানার পর তাদের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংসদে গিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। পার্লামেন্টারি অথবা প্রেসিডেন্সিয়াল যে কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই নির্বাচনে পরাজিত দলের নেতা আগে পরাজয় স্বীকার করে জয়ী দলের নেতাকে অভিনন্দন জানান এবং জয়ী দলের নেতাও পরাজিত দলের নেতাকে প্রত্যুত্তরে অভিনন্দন জানিয়ে সরকার পরিচালনায় বিরোধী দলের সাহায্য-সমর্থন কামনা করেন। যেমন আমেরিকায় বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন এ কথা সরকারিভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই রিপাবলিকান দলের পরাজিত প্রার্থী ম্যাককেইন পরাজয় স্বীকার করে তাকে অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারী শাসনের দাপটে গণতন্ত্রই যেখানে স্থায়ী হয়নি, সেখানে এই গণতান্ত্রিক রেওয়াজটি কীভাবে চালু হবে? তবু ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে দেশের দুটি বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন, নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠু হয় তাহলে তার ফলাফল মেনে নিতে তারা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করবেন না। বিশেষ করে খালেদা জিয়া এই প্রতিশ্রুতি বিশেষভাবেই দিয়েছিলেন।

নির্বাচনটি হয়েছে এবং দেশ-বিদেশের সব মহল দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন যে, এত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আর হয়নি। এমনকি দেশের সব দলমতের ভোটদাতারাও স্বীকার করেছেন, এমন ভয়শূন্য ও শান্তিপূর্ণভাবে গত কয়েকটি নির্বাচনেই তারা ভোট দিতে পারেননি। তথাপি নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার পর বিএনপি নেত্রী ম্যাডাম 'নো' গোঁ ধরে বললেন, 'এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে চক্রান্ত করে জেতানো হয়েছে।' এই ধরনের ডাহা অসত্য অভিযোগ জানানোর পর তো আর বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানানো যায় না।

কথায় বলে, জন্ডিস রোগী সারা পৃথিবীকেই হলুদ বর্ণের দেখে। অনেকে বলেন, এবার ম্যাডামের 'নো'র বেলাতেও হয়েছিল তাই। ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনে তার দলকে যে কায়দায় নির্বাচনে জেতানো হয়েছিল, তিনি নিজে হয়তো বিশ্বাস করেছিলেন এবং দেশবাসীকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে, এবারে আওয়ামী লীগকে সেই কায়দায় জেতানো হয়েছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনের ট্রান্সপারেন্সি ছিল এতই স্পষ্ট যে, এত বড় মিথ্যাটা আর কাউকে গেলানো যায়নি, এমনকি স্বদলের সাধারণ নেতা-কর্মীদেরও নয়। সুতরাং ডিসেম্বর নির্বাচনের রায় মেনে বিএনপিকে যে সংসদে যেতে হবে এটা সবাই-ই ধরে নিয়েছিলেন এবং বিএনপির সংসদ সদস্যরা শেষ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না বলে সবার মনেই আশা সঞ্চার করেছেন।

নির্বাচনে জয়-পরাজয় তো কোনো স্থায়ী ব্যাপার নয়। নির্বাচনে এবার বিএনপি বিশাল পরাজয় বরণ করেছে। জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারলে ভবিষ্যতে তারা বিশাল বিজয় অর্জন করতে পারে। গণতন্ত্রের এই চমৎকার প্রক্রিয়াটির প্রতি আস্থা থাকলে খালেদা জিয়া অবশ্যই শেখ হাসিনাকে তার দলের জয়ে অভিনন্দন জানাতেন এবং শেখ হাসিনাও তাকে পাল্টা অভিনন্দন পাঠাতেন। শুরু হতো বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মতো গণতন্ত্রের পথে সরকারি ও বিরোধী দলের সহযোগিতায় এক ঐতিহাসিক শুভযাত্রা।

বিএনপির নেতা-নেত্রীদের অহেতুক গোঁ ধরার ফলে সেই শুভযাত্রাটি আশানুরূপভাবে শুরু হতে পারেনি। ম্যাডাম 'নো' গোঁ ধরে থাকুন; বিরাট নির্বাচন বিজয়ের অধিকারী শেখ হাসিনা তো আরেকটু উদার হতে পারতেন। পারতেন খালেদা জিয়াকে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় তার সহযোগিতা চাইতে। তিনি তা কেন করেননি, তা আমি জানি না। কিন্তু ঢাকার এক বন্ধু আমাকে জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে সাংবাদিকরা নির্বাচনের পরে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি নাকি বলেছেন, 'আমি বিএনপি নেত্রীকে টেলিফোন করতে গিয়েও রিসিভার তুলিনি। ভেবেছি, তিনি যদি টেলিফোন না ধরেন, কথা বলতে না চান।'

যা হোক, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই শুভ পুনরারম্ভের সূচনায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অভিনন্দন বিনিময়ের প্রারম্ভিক শুভ প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত থাকলেও ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি যেমন সামান্য ছলছুতোয় সংসদ বর্জন করে রাস্তায় নেমে গিয়েছিল, এবার তা না করে যে সংসদে এসে শপথ গ্রহণ করেছে তাতে আশা হয়, তারা অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি আর করতে চাইবে না। আর করতে চাইলেও তাতে দেশের কোনো মহলেরই সমর্থন পাবে না। কারণ, এবার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিয়ানব্বই-পরবর্তী পরিস্থিতির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর দেশের মানুষও গত সাত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেক সতর্ক ও সচেতন।

সুতরাং বিএনপি যখন সংসদে যোগ দিয়েছে এবং বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করতে যাচ্ছে, তখন অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সংশোধন করবে এবং জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে দীর্ঘকালের লিভিং টুগেদারের ফলে দলটির গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি যেভাবে নষ্ট হয়েছে, তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হবে– এটা আরো অনেকের সঙ্গে আমারও প্রত্যাশা। এখন দেখার হলো, সংসদে উপদল নেতা (উবঢ়ঁং খবধফবৎ) মনোনয়নে বিএনপি আমাদের সেই আশা পূর্ণ করতে পারে কি-না? বিএনপি জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে মিলেমিশে অতীতে যে ধরনের রাজনীতি করে জনসমর্থন হারিয়েছে, সেই একই ধরনের রাজনীতি দলটি এখনো ধরে রাখতে চায়, না খালেদা জিয়া দলকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চান তাও কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে।

ঢাকার বিএনপি সংশ্লিষ্ট মহল থেকে আভাস পেয়েছি, খালেদা জিয়া তার গত দুই বছরের ভাগ্য বিপর্যয় এবং বর্তমান নির্বাচন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, বিএনপিকে এবং তার নেতৃত্বকে বাঁচাতে হলে স্বাধীনতাবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী শিবিরের সঙ্গে আঁতাত বর্জন করে তাকে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসতে হবে। এ জন্য তিনি গ্রহণ-বর্জনের নীতি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ জামায়াতকে বর্জন ও দল থেকে সরে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা অংশকে কাছে টেনে আনবেন। এককথায় বিএনপিকে পুনর্গঠন করবেন। এই আভাস সত্য হলে দেশের রাজনীতিতে বিএনপির উঠে দাঁড়াবার এখনো সম্ভাবনা আছে।

অতীতেও বিএনপি একটি ভয়ানক ভাগ্য বিপর্যয় থেকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক দলের চেহারা ধারণ করেছিল এবং রাজপথের আন্দোলনে নেমে এসে আওয়ামী লীগের শক্তি ও নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত বিএনপি সরকার এরশাদের ক্যুর ফলে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর মনে হয়েছিল, সেনাছাউনিতে জন্ম নেওয়া দলটি আইয়ুবের কনভেনশন লীগ, ইস্কান্দার মির্জার রিপাবলিকান পার্টির মতো শেষ হয়ে গেছে। দলটি আর কোনোদিন মাথা তুলতে পারবে না।

কিন্তু দলের সেই দুঃসময়ে বিধবা গৃহবধূর ভূমিকা ত্যাগ করে খালেদা জিয়া তার অনভিজ্ঞ হাতে দলের হাল ধরেন। তিনি দলটিকে সেনাছাউনি থেকে বের করে রাজপথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি নিজে শেখ হাসিনার পাশাপাশি এরশাদ হটাও আন্দোলনে সাহসী নেতৃত্ব দেন এবং বিএনপির একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে পুনর্জন্ম ঘটে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপির অপ্রত্যাশিত বিজয় গণতান্ত্রিক দল হিসেবে তার পুনর্জন্ম গ্রহণের ফল।

১৯৯১ সালে গঠিত খালেদা জিয়ার প্রথম মন্ত্রিসভা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধিবিধান অনেকটাই মেনে চলেছে। তিনি বিরোধী দল ও জনমতের দাবি মেনে রাষ্ট্রপতিশাসিত

ব্যবস্থার বদলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসেন এবং তার পাঁচ বছরের শাসনে ছোট-বড় নির্বাচন কারচুপি ও ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ছাড়া বড় অভিযোগ করার মতো কিছু একটা করেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিও তিনি মেনে নেন। কিন্তু ক্ষমতায় থাকার শেষ পর্যায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কারচুপি করতে গিয়েই তাকে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে হয়।

এরপর ১৯৯৬ সাল থেকে সংসদে ও সংসদের বাইরে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি তার অবস্থান ঠিক রাখলে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেমন শক্তিশালী হতো, তেমনি গণতান্ত্রিক দল হিসেবেও বিএনপি প্রকৃত গণভিত্তি পেত। তাকে উত্তরপাড়া বা জামায়াতের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হতে হতো না। খালেদা জিয়া যে কোনো পন্থায় আবার দ্রুত ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে জামায়াত ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্রগুলোর সঙ্গে হাত মেলান। ক্রমে ক্রমে তিনি পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা চক্র আইএসআইর চরদের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকেন।

এরপরই শুরু হয় গণতন্ত্রের উল্টোপথে বিএনপির যাত্রা। দলের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতা-কর্মীরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েন। বিএনপি রাজনীতিতে বড় ছেলে তারেকের অভ্যুদয় ও আধিপত্য বিস্তার বিএনপিকে সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারেক জামায়াত ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্ব দেন এবং সরকার ও দলের ভেতরে সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের এক বিরাট অনুগত গ্যাং সৃষ্টি করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে দেন। বিএনপি ক্রমে ক্রমে জামায়াতের হাতের মুঠোয় চলে যাওয়ায় দেশে সরকারি মদদে মৌলবাদী সন্ত্রাস চরমে ওঠে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, সংবিধানের বিধিবিধান সবকিছু জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষেপ করে বিএনপি-জামায়াত জোট ২০০৬ সালের নির্বাচনেও কারসাজি, ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে জয়লাভের নীলনকশা তৈরি করে।

ওয়ান-ইলেভেন যে উদ্দেশ্যেই এসে থাকুক, এই ওয়ান-ইলেভেনের ফলে বিএনপি-জামায়াতের চক্রান্তের নীলনকশা ব্যর্থ হয়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের যে শোচনীয় ভরাডুবি হলো, তার মূল কারণও বিএনপি-জামায়াত জোটের পাঁচ বছরের দুঃসহ অপশাসনের বিরুদ্ধে আমজনতার ক্রোধ ও ঘৃণার বিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণেও দেখা যায়, জনক্রোধ জামায়াতকে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু বিএনপিকে ১৯৫৪ সালের মুসলিম লীগের মতো একেবারে প্রত্যাখ্যান করেনি। খালেদা জিয়া বিরোধী দল গঠনের মতো সংখ্যাশক্তি নিয়ে সংসদে ফিরেছেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে তার সঙ্গে দরকষাকষি করে যে জামায়াত তার কাঁধে চড়েই এবার অধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, ভোটদাতারা তাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিএনপির জন্য এবারের নির্বাচকমণ্ডলীর মেসেজ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিএনপিকে আওয়ামী লীগের বিকল্প আরেকটি গণভিত্তিক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে মানুষ দেখতে চায়। তারা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী, হিংস্র মৌলবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শিবিরের মিত্র একটি অগণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিএনপিকে দেখতে চায় না। চায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিবিরের আরেকটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দল হিসেবে দেখতে। চায় দেশে প্রকৃত বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং বড় দুটি দলের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে পালাক্রমে ক্ষমতার হাতবদল। আওয়ামী লীগের জন্যও দেশের মানুষের এই একই মেসেজ। দেশে একদলীয় ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শাসন নয়, সাধারণ মানুষ চায় দ্বিদলীয় সুস্থ অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি।

এই মেসেজটি বিএনপি এবং খালেদা জিয়া সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন কি-না তা দু'একদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। বিএনপি সংসদে এসে শপথ গ্রহণ করায়, সংসদের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত, এমনকি সরকারি দল সংসদের ডেপুটি স্পিকার হওয়ার জন্য বিএনপিকে যে অফার দিয়েছে তা গ্রহণের আগ্রহ দেখানোর ফলে মনে হয়, খালেদা জিয়া এবং তার দল হয়তো এবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধরে রাখার পথেই এগোবেন। নব্বইয়ের দশকে তিনি একবার এরশাদ হটাও আন্দোলনে জনতার কাতারে নেমে এসে দলটিকে গণতান্ত্রিক চরিত্র দান করেছিলেন। এবার হয়তো আবার তিনি দলটিকে গণতান্ত্রিক দল হিসেবে পুনর্গঠনের জন্য সক্রিয় হবেন, দলকে জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের কবজা থেকে মুক্ত করার এবং দলের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতা-কর্মীদের আবার দলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেবেন। ঢাকায় বিএনপি সংশ্লিষ্ট একটি মহল আমাকে খালেদার নেতৃত্ব ও বিএনপির এই রূপান্তরেরই আভাস দিচ্ছেন। তাদের এই অনুমান কতটা সত্য তা বিএনপির সংসদীয় দলের উপনেতা হিসেবে খালেদা জিয়া কাকে বেছে নেন তা থেকেই বোঝা যাবে। ঢাকার কাগজে বলা হয়েছে, সাকা চৌধুরী এই উপনেতা হতে পারেন। সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে খালেদা জিয়াকেই এই মনোনয়নের ভার দেওয়া হয়েছে। আবার দলের ভেতরে সাকা চৌধুরীকে এই মনোনয়ন দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা রয়েছে। সাকা চৌধুরী অবশ্য সম্প্রতি জোর গলায় বলেছেন, 'তাদের দলে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই।' তিনি তো কোনো যুদ্ধাপরাধী দেখতে পান না। সাকা চৌধুরীর এই কথার জবাবে শুধু একটি কথাই বলা যায়, তিনি সম্ভবত আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন না; দেখলে ঠিকই যুদ্ধাপরাধীদের খোঁজ পেতেন।

এটা সত্য, খালেদা জিয়ার আশপাশে এখন ডা. বি চৌধুরী, কর্নেল (অব.) অলি, মান্নান ভূঁইয়া প্রমুখের মতো কোনো অভিজ্ঞ রাজনীতিক নেই, যাদের মধ্য থেকে তিনি ডেপুটি লিডার বেছে নিতে পারেন। বহুরূপী অথচ অভিজ্ঞ মওদুদ আহমদও এবার নির্বাচনে পরাজিত। সুতরাং সাকা চৌধুরীর দিকে তার নজর পড়তেই পারে। কিন্তু এখনো তার আশপাশে এম কে আনোয়ারসহ বেশ কয়েকজন দলীয় নেতা আছেন, যাদের সংসদীয় দলের উপনেতা হিসেবে বেছে নিয়ে তিনি দেশবাসীর কাছে এই সিগন্যালটাই পৌঁছাবেন যে, তিনি বিএনপিকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে এনে পুনর্গঠনের জন্য দ্বিতীয়বার বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং এই লক্ষ্যে দলকে তিনি জামায়াতের খপ্পর ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবেন।

তা যদি হয়, তাহলে অনেকের মতো আমারও ধারণা, বিএনপি বাঁচবে, খালেদা নেতৃত্ব বাঁচবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎও শঙ্কামুক্ত হবে। তা নইলে খালেদা নেতৃত্ব যেমন টিকবে না, তেমনি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখা যাবে না। খালেদা জিয়া দেখেছেন, জামায়াতের সমর্থন এবারের নির্বাচনে তার দলকে ভরাডুবি হতে রক্ষা করতে পারেনি। তিনি জামায়াতের মতো দুষ্টগ্রহের কবজা থেকে মুক্ত হলে দেশের গণতন্ত্রমনা সাধারণ মানুষের যে আস্থা ও সমর্থন ফিরে পাবেন, তা বিএনপি ও তার নেতৃত্বের অনেক বেশি শক্তিশালী গণভিত্তি তৈরি করবে। এই সত্যটা তিনি এখন উপলব্ধি করেন কি-না, সংসদীয় দলের উপনেতা হিসেবে তিনি কাকে বেছে নেন, তা থেকেও তার একটা আভাস পাওয়া যাবে।

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০০৯